45

দৈনিক খবর

তারিখ ২/৯/৯১ পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস এবং শিক্ষকদের দায়িত্ব

।। হাবিবুর রহমান ।।

... সবচেয়ে ... বিষয় হচ্ছে সন্ত্রাসী ... ব্যাপক বিস্তারের পটভূমিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের ৭০-৮০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়া। একপক্ষ চাচ্ছে এর দায়-দায়িত্ব ছাত্রদের ওপর চাপাতে; আরেক পক্ষ বলছে সেটা বাইরে থেকে আরোপিত, তথা রাজনীতিবিদদের প্রশ্রয়ে বিকশিত; তৃতীয় আরেক পক্ষ শিক্ষাঙ্গনের প্রধান শক্তি শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সমাজকেও এর সাথে জড়াচ্ছে।

শিক্ষকদের জড়ানো সহজ হবে না। তাদের রয়েছে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার দীর্ঘ ঐতিহ্য। ষাটের দশকে ডঃ আবু মাহমুদ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার থেকে নির্যাতিত হয়েছিলেন। তাঁর উত্তরসূরী অনেকে আছেন। বলা যায়, আর কোন পেশাজীবী সংগঠন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ততটা সোচ্চার নয়, যেমন শিক্ষক সমাজ। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বিবৃতি দিয়ে জনমত সৃষ্টি করেছেন, সেমিনার করেছেন, মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এককভাবে তারা সবচেয়ে বেশী প্রবন্ধ লিখেছেন। বলতে কি, শিক্ষা ও সন্ত্রাস এক সাথে চলতে পারে না বলে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহার করা জনপ্রিয় শ্লোগানের উদ্গাতা তারাই। সুতরাং, চট করে শিক্ষকদের সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত করা সহজে গ্রহণযোগ্য হবে না।

তবু শিক্ষকরাই সমাজের প্রধান অংশ নন। তাদের বাইরে রয়েছে অনেক পেশাজীবী সংগঠন। এর বাইরে রয়েছে বিশাল সাধারণ মানুষের সমষ্টি। তাদের অনেকের ধারণা যে, শিক্ষকদের একাংশ হোক না নগণ্য, সন্ত্রাসবাদীদের ব্যবহার করেন নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থে। তারা নিজেদের দলীয় রাজনীতি করার প্রয়োজনে ছাত্রদের কাজে লাগান।

বলতে কি, ধারণাটি এত ব্যাপক যে, অগ্রাহ্য করতে গেলে অনেক যুক্তি ও তথ্য দিতে হবে। এর ব্যাপকতা সম্পর্কে কয়েকটি প্রমাণ দেয়া যেতে পারে। কয়েক বছর আগে বাংলাদেশ টেলিভিশন যে জনপ্রিয় ধারাবাহিক নাটক প্রচার করেছিল 'সকাল-সন্ধ্যা' নামে তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপককে দেখানো হয়েছে ছাত্রদের হাতে রিভলবার তুলে দিতে রাজনীতির নামে। নাটকের লেখিকা বহুদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কর্মরত ছিলেন। তাঁর ধারণাকে অনেকে গভীরভাবে গ্রহণ করেছে। দ্বিতীয় উদাহরণ, বিখ্যাত আইনজীবী শামসুল হক চৌধুরীর একটি বক্তব্য। এডভোকেট চৌধুরী এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। দেশের অনেকে তাঁকে মানে ও চিনে। তাঁর মত দায়িত্বশীল ব্যক্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে অভিভাবক সমাবেশে যা বলেছেন, সেটা দৈনিক পত্রিকা থেকে হুবহু উদ্ধৃত করা হলঃ শিক্ষকদের ভূমিকার সমালোচনা করে এডভোকেট শামসুল হক চৌধুরী বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের যে ভূমিকা নেয়া উচিত, তা তারা করছেন না। অনেক শিক্ষক ছাত্রদের তাদের মতবাদ ও স্বার্থের জন্য ব্যবহার করেন। এটা লজ্জাজনক। শিক্ষকদের এটা পরিহার করতে হবে।' [দৈনিক বাংলা, ৮ ভাদ্র, ১৩৯৮]

আরো দু'টি উদাহরণ দেয়া যায় সরকারী পর্যায়ের। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জামায়াতে ইসলামীর অঙ্গ সংগঠন ছাত্র শিবিরের সদস্যদের দ্বারা নির্যাতিত। জামায়াতের নেতা মওলানা নিজামী নির্যাতিত হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ২৭শে মে। দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য হাইকোর্টের দু'জন মাননীয় বিচারপতির নেতৃত্বে তদন্ত কমিশন গঠিত হয়েছিল। প্রথমটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয়টির সারমর্ম পত্রিকায় বেরিয়েছে। দু'টোতেই শিক্ষকদের জড়িত থাকার বিষয়টি এসেছে। হয়ত সিদ্ধান্ত সঠিক নয়, কিন্তু তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, শিক্ষকদের সম্পর্কে বাজে ধারণা সমাজের কত গভীরে প্রোথিত হয়েছে- যার জন্য হাইকোর্টের বিচারপতিরাও সেটা অগ্রাহ্য করেন না।

সেটা কেমন করে হল? উত্তর অতি সোজা। কোন কোন শিক্ষক অতীতে এমনভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন যাতে তেমন ধারণা তৈরী হয়েছে। তাঁরা নিজেরা সরাসরি জড়িত না হতে পারেন, কিন্তু অন্যায়ের প্রতি চোখ বুঁজে ছিলেন। তাঁদের বিবেক তখন কাজ করেনি। চারটি উদাহরণ উত্থাপিত করা গেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। প্রথমটি ১৯৮৬ সালের জানুয়ারী মাসের ঘটনা। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সন্ত্রাসী অংশটির হামলায় উপাচার্য মোহাম্মদ শামসুল হক পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। দুষ্কৃতকারীরা তাঁর সরকারী বাসভবন আক্রমণ করেছিল এবং কয়েকদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় তান্ডব সৃষ্টি করছিল। আশ্চর্যের বিষয় যে, সেই ঘটনার কোন নিন্দা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি করেনি। একটি দৈনিক পত্রিকা 'বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ভিন্নধারায় ভাবিতেছেন' শিরোনামে লিখেছিল-'গতকালের ঘটনার পর আভাষ স্পষ্ট হয়ে উঠে, শিক্ষক সমিতির বর্তমান নেতৃত্ব ও তাদের সংগঠকরা আর ভাইস চ্যান্সেলরকে সংকট মুহূর্তে সমর্থন দিয়া রক্ষা করিতে চান না।' (দৈনিক ইত্তেফাক; ৯-১-৯১) পরাজিত উপাচার্য চলে গেলে অধ্যাপক আব্দুল মান্নান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তারপরেই অধ্যাপক কে এম সাদ উদ্দিনের নেতৃত্ব শিক্ষক সমিতির মিছিল বের করা হয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে অধিক মাত্রায় সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল মান্নানের সময়ে। দশ- পনের জন ছাত্র নিহত হয়েছিল সে আমলে। জনমতের চাপে তিনি একটি কমিটি গঠন করেন সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করার জন্য। প্রাথমিক রিপোর্টে তিনটি প্রধান ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন প্রধান সন্ত্রাসীকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু পরে দলীয় প্রভাবশালীদের চাপে একটি বিশেষ দলের সন্ত্রাসীদের নাম বাদ দিয়ে শুধু অন্যদের নাম সুপারিশ করা হয় এবং তারা বহিষ্কৃত হয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এটা একটি জনশ্রুতি এবং ব্যাপক আকারে প্রচলিত। উপাচার্য জহুরুল হক পরিদর্শনে গিয়ে সন্ত্রাসীদের কবলে পড়েছিলেন। তারাও চিহ্নিত হয়নি। তিনি এখন আর বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। কিন্তু কমিটির আহবায়ক রয়েছেন। প্রকৃত ব্যাপার তিনি অবশ্যই জানেন। তাঁর উচিত প্রকৃত ব্যাপারটি সবাইকে জানানো। নতুবা বিভ্রান্তি রয়ে যাবে।

তৃতীয় ঘটনা মওলানা নিজামীর লাঞ্ছনা। সব নিরপেক্ষ ব্যক্তি ও গোষ্ঠী তার নিন্দা করেছে, কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ব্যতীত। অথচ তিনি তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিমন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যায়ে গিয়েছিলেন। একজন ছাত্র অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করতে গেলে স্বাভাবিকভাবে তিনি তাদের বলেছিলেন, 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির কর্মীদের কার্যকলাপ যেমন নিন্দনীয়, তেমনি অন্য নেতাদের সঙ্গে শিক্ষাঙ্গন পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের আমন্ত্রণে সেখানে যাওয়া জামায়াত নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর ওপর হামলাও সমানভাবে নিন্দনীয়।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সেই দুঃখজনক ঘটনার নিন্দা করতে ব্যর্থতা সন্ত্রাসীদের মনোবল নিশ্চয়ই অনেকগুণ বাড়িয়েছে।

বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়ার কার্যালয়ও ইদানীং একাবর ভাঙচুর হয়েছে -অধ্যাপক শামসুল হকের মতই। এই ভাঙচুরের প্রতিক্রিয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাসখানেক ধরে বন্ধ হয়ে আছে। কিন্তু কেন সেই বর্বরতা? বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকই কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। ১৯ শ্রাবণ, ১৩৯৮ তারিখের একটি পত্রিকার উপ-সম্পাদকীয় স্তম্ভে ডঃ হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন- ''উপাচার্যের কার্যালয় ভাঙ্গার পেছনে ওই পদটির জন্যে অনেকের অভিলাষ কাজ করে থাকে। যারা ভাঙে, তারা উপাচার্য হবে না, তবে তাদের উৎসাহদাতাদের কেউ কেউ চায় উপাচার্য হতে। 'আরেকটু ঠ্যালা দাও, মিঞাটা পড়ে যাবে'- বলে একটি কথা এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে। জনশ্রুতিটি থেকে যে সত্য পাই, তা হচ্ছে 'ঠ্যালা' দিচ্ছে একদল, তাদের পেছনে আছেন প্রার্থীরা।''

উপসংহার

সমস্যাটা জটিল। সমাজের এক বিরাট অংশে শিক্ষকদের একাংশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসে উস্কানি দানের অভিযোগ উত্থাপন করেন। এটা প্রমাণ করার দায়িত্ব কাদের? এ কলংক হোক না অতিরঞ্জিত বা আরোপিত, মুছতে দীর্ঘ সময় লাগবে। তবে মুছতে হবে অবশ্যই। কারণ শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমন্ডলীই পারেন শিক্ষাঙ্গনকে পবিত্র করতে। আর কেউ নয়। রাজনীতিবিদ, ছাত্র বা অভিভাবকদের চেয়ে তাদের ওপর ভরসা করে আছে বৃহৎ সমাজ।